Thomas Stearns Eliot (1888-1965)

বিশ শতকের আধুনিক কবিতার অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব টি এস এলিয়ট। কবিতা ছাড়া সাহিত্য সমালোচনা ও কাব্যনাট্যেও তাঁর মৌলিকতা অবিসংবাদিত। কেবল ইংরেজি সাহিত্য নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে আধুনিকতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন তিনি। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন, মননশীলতা তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি সংবেদনশীল, বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী, দার্শনিক, আধুনিক নৈরাশ্যবোধে পীড়িত অথচ আস্তিক্য ভাবনায় সমুজ্জ্বল। এ যুগের মানুষের জীবনসংকট, বিচ্ছিন্নতা, গ্লানি তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এলিয়টের জীবৎকালেই বাংলা কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ তাঁর কাছে ঋণী হতে শুরু করেছে। তিনের দশকের বাঙালি কবিরা— যেমন, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ তাঁর প্রতিভায় প্রভাবিত।

জীবনকথা

১৮৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুইস শহরে এলিয়ট-এর জন্ম। স্নাতক স্তরের শিক্ষা লাভ করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর কিছুদিন প্যারিসে কাটিয়ে আবার ফিরে যান হার্ভার্ডে ও পড়াশোনা করেন দর্শন, বিশেষত ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত নিয়ে। ১৯১৪-র পর থেকে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসেন। এই বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। চিত্রকল্পবাদী কবি এজরা পাউন্ড-এর সান্নিধ্যে আসেন এলিয়ট। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। এই বছরই তাঁর বিবাহ হয় ভিভিয়েন হেই উড-এর সঙ্গে। ব্র্যাডলে-কে নিয়ে গবেষণা পত্র জমা দিয়েছেলেন ১৯১৬-তে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মৌখিক পরীক্ষায় এলিয়ট অকৃতকার্য হন। একটি স্কুলে পড়াতে শুরু করলেন এলিয়ট, পরে চাকরি নিলেন ব্যাঙ্কে।। ১৯২৭ থেকে গ্রহণ করলেন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব। সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন ক্রমশ। ১৯৪৮-এ লাভ করলেন নোবেল পুরস্কার। টি এস এলিয়টের প্রয়াণ ঘটে ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে।

গুরুত্বপূর্ণ রচনা

কাব্যগ্রন্থ

Prufrock and Other Observations (1917)

The Waste Land (1922)

The Hollow Man (1925)

The Journey of the Magi (1927)

Ash-Wednesday (1930)

Four Quartets (1945) প্রভৃতি।

নাটক

The Rock (1934)

Murder in the Cathedral (1935)

The Family Reunion (1939)

The Cocktail Party (1949)

প্রবন্ধ

Tradition and Individual Talent (1920)

Dante (1929)

Poetry and Drama (1951)

On Poetry and Poets (1957)

বাংলা কাব্যজগতে এলিয়ট-এর প্রভাব

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে চলছে ঔপনিবেশিক শাসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বাঙালি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রবলভাবে আগ্রহী। উনিশ শতকের বাঙালি আয়ত্ত করেছিল মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্য সংরূপগুলির বহিরঙ্গ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতেই বাঙালি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সমগ্রতাসহ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তবতা ও তাত্ত্বিকতাকে অনুধাবন করতে চাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে প্রায় সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) সাফল্য। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাঙালির সাহিত্য সর্বাধিক প্রভাবিত হল কার্ল মার্কস ও সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর তত্ত্ব-দর্শন দ্বারা।

বিশ শতকের তিনের দশকের বাঙালি কবিদের কবিতায় গুরত্ব পেল চিন্তন-মননের দিকগুলি। বলা যেতে পারে বাংলা কবিতা হয়ে উঠল বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। এই সময়ের কবিদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করলেন টি এস এলিয়ট।

বাঙালি কবিদের মধ্যে প্রথম এলিয়ট-এর নাম করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কাব্যাদর্শের দিক থেকে যদিও উভয়ের অমিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভালো-লাগার কবিরা হলেন শেলি, কিটস, ব্রাউনিং, বায়রন, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন প্রমুখ। এঁরা উনিশ শতকীয় রোম্যান্টিক কবি। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে ('পরিচয়' পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩৯) তিনি প্রথম এলিয়ট-এর নাম করলেন এবং তাঁর 'প্রিলিউডস্' ও 'আন্ট হেলেন'

কবিতাদুটির আংশিক অনুবাদ করলেন; কিন্তু এ দুটি যে তাঁর ভালো লাগেনি তাঁ রবীন্দ্রনাথের অভিমত থেকে স্পষ্ট। পরে নাম না জেনেই রবীন্দ্রনাথ এলিয়ট-এর 'জার্নি অফ দ্য মেজাই'-এর অনুবাদ করেন 'তীর্থযাত্রী' নামে ('পুনশ্চ', ১৩৩৯)। পরে রবীন্দ্রনাথ এলিয়ট-এর বহু লেখা পড়েছেন তা তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায়।

এলিয়ট বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'ঐতিহ্য ও টি এস এলিয়ট' ('পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৪১) ও 'কাব্যের মুক্তি' (১৯৩০) এবং অমিয় চক্রবর্তীর 'উত্তর সামরিক সাহিত্য' ('বৈশাখী' সংকলন, ১৯৪১-৪২)। জীবনান্দ দাশের 'কবিতার কথা' বইতে (১৯৬২) বহুবার এলিয়ট-এর নাম ও তাঁর উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। জীবনানন্দের 'ঘোড়া', 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' প্রভৃতি কবিতায় এলিয়ট-এর প্রভাব লক্ষ করেছিলেন 'পূর্বাশা'-সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। এলিয়টকে সর্বাধিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন বিষ্ণু দে। এলিয়ট-এর সর্বাধিক কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন তিনিই। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'এলিঅট প্রসঙ্গে' (১৯৬৫)। এলিয়ট-এর কবিতা সম্পর্কে বিরাগ জানিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু।

The Waste Land

'The Waste Land' কবিতার রচনাকাল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ। সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে জলবায়ু পরিবর্তন করতে গিয়ে কবিতাটি রচনা করেন এলিয়ট। ১৯২২-এর অক্টোবর মাসে এলিয়ট-সম্পাদিত 'The Criterion' পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পরের মাসে আমেরিকার 'The Dial' পত্রিকায় কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২২-এর ডিসেম্বর মাসে। জেমস জয়েস-এর চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস 'ইউলিসিস' (১৯২২) ছাড়া বিশ শতকের সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ সম্ভবত এটিই। নানা পুরাণ, উপকথা, ধর্মকথা, মিথ ও সাহিত্যগ্রন্থ থেকে এর চিত্রকল্পগুলি গৃহীত। প্রথমে রচনাটির দৈর্ঘ্য ছিল বর্তমান আকারের প্রায় দ্বিগুণ। ইমেজিস্ট আন্দোলনের পুরোধা কবি এজরা পাউন্ড (Ezra Pound)-এর পরামর্শে তিনি কবিতার বহু অংশ বাদ দিয়ে পরিমার্জনা করেন এবং এজরা পাউন্ডকেই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। বর্জিত ছত্রগুলি থেকে গড়ে ওঠে 'জেরনেশন' কবিতা।

জে সি ওয়েস্টন-এর 'From Ritual to Romance' এবং জেমস ফ্রেজার-এর 'The Golden Bough' গ্রন্থ দুটি থেকে এলিয়ট বহু চিত্রকল্প গ্রহণ করেছেন এই কবিতায়। পাশ্চাত্য পুরাণকথায় আছে রাজা আর্থারের হোলি গ্রেল-এর কাহিনি। হোলি গ্রেল হল শেষ ভোজনে যিশুর ব্যবহৃত পানপাত্র। হারিয়ে যাওয়া এই পানপাত্রকে উদ্ধার করতে রাজা আর্থারের নাইটরা বেরিয়ে পড়ে। একমাত্র পবিত্র চরিত্রের নাইট স্যার গ্যালাড তা উদ্ধার করেন। সেটি এক ধীবররাজের অধীনে ছিল। কিন্তু রাজার পাপে রাজ্যর অজন্মা দেখা দেয় এবং গোটা রাজ্য হয়ে ওঠে এক পোড়ো জমি বা 'Waste Land'।

'The Golden Bough'-তে মিশর ও গ্রিসের শস্যের দেবতা আত্তিস, অসিরিস ও অ্যাডোনিস-এর মৃত্যু ও পুনর্জীবনের মিথ বর্ণিত হয়েছে। শীত ও বসন্ত প্রকৃতিতে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রতীক। পরে খ্রিস্টধর্মে প্রাচীন এই দেবতাদের পুনর্জীবন যিশুর পুনরুত্থানের সঙ্গে একীকৃত হয়ে যায়। 'The Waste Land' কবিতায়

শীত ও বসন্ত তথা মৃত্যু ও জীবনের চিত্রকল্প এরই প্রভাবে গড়ে উঠেছে। এই কবিতায় সরাসরি 'মানবপুত্র' যিশুর উল্লেখও আছে।

৪৩৪ পংক্তির দীর্ঘ এই কবিতাটি পাঁচটি অসমান অংশে বিভক্ত—

1. The Burial of the Dead ('অন্ত্যেষ্টি')

2. A Game of Chess ('দাবার বাজি')

3. The Fire Sermon ('অগ্নি-বাণী')

4. Death by Water ('সলিল-সমাধি')

5. What the Thunder Said ('বজ্রবাণী')

কবিতার প্রথমাংশ *The Burial of the Dead* শুরু হচ্ছে সেই অবিস্মরণীয় পংক্তিমালা দিয়ে—

'April is the cruellest month, breeding

Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and Desire, stirring

Dull roots with spring rain.'

এখানে বলা হয়েছে সেই এপ্রিল মাসের কথা যখন বন্ধ্যা মৃত ভূমিতে লাইলাক ফুলের গাছ মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে স্মৃতি ও বাসনা মিশিয়ে, শুষ্ক শিকড়ে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন, বসন্তের আগমনের এপ্রিল মাসকে 'নিষ্ঠুর' বলা হয়েছে কেন? এই মাস নিষ্ঠুর পোড়ো জমির বাসিন্দাদের কাছে, যাদের কাছে শীত ছিল আরামের ঋতু, যখন তারা বিস্মৃতির সুখে নিমজ্জমান ছিল। তাই তাদের মনে হয়— 'আমরা ছিলাম শীতে উষ্ণ বরাবর।' আসলে এই জটিল আধুনিক কবিতায় একধিক কথকের স্বর মিশে আছে। এ কাব্যের কোনো কেন্দ্রীয় ঐক্য নেই। একই ব্যক্তির বহু ভগ্নাংশ অথবা বহু ব্যক্তির আংশিকের সমবায়ে এই কাব্য গঠিত।

প্রথম স্তবকের পরবর্তী অংশের কথকের নাম 'মারী'। এই অংশের প্রায় দশটি পংক্তি জুড়ে কাউন্টেস মারি লারিশ রচিত 'মাই পাস্ট' (১৯১৩) নামক স্মৃতিকথা থেকে বিভিন্ন টুকরো ঘটনার উল্লেখ করেছেন এলিয়ট। এখানে বলা হয়েছে মারি বসবাস করতেন জার্মানির স্টার্নবের্গাসিতে, শীতকালে দক্ষিণে বেড়াতে যেতেন এবং স্বাধীন মুক্ত জীবন তাঁর প্রিয় ছিল।

দ্বিতীয় স্তবকে 'মানব সন্তান' যিশুকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে—

'ভগ্ন প্রতিমার স্তূপ, যার উপর সূর্য হানে কর,

মরা গাছ দেয় না কোনো আশ্রয়, কিংবা উপশম ঝিঁঝি পোকা,

না জলের শব্দ কোনো শুষ্ক শিলা।'

এই চিত্রকল্পের মধ্যে আধুনিক পৃথিবীর আশ্রয়হীনতা দ্যোতিত হয়েছে। এই স্তবকের শেষে এলিয়ট একটি আইরিশ ছেলেভুলানো ছড়া উদ্ধৃত করেছেন। তৃতীয় স্তবকে হায়াসিনথ বালার কথনেও রিক্ততা শূন্যতার প্রসঙ্গ এসেছে।

চতুর্থ স্তবকে কবি উল্লেখ করেছেন ইউরোপের এককালের নামজাদা গণৎকার শ্রীমতী সোসোস্ত্রিস-এর কথা, যিনি জাদুতাসের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বলতেন। কিন্তু আধুনিক জীবন এতটাই জটিল আর অনিশ্চিত যে অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী আর করা যায় না। মানুষের ভবিষ্যৎ সাদা তাসের মতোই অনিশ্চিত।

শেষ স্তবকে কবির লন্ডন শহরকে মনে হয়েছে 'Unreal city'। লন্ডন ব্রিজের ওপরে পিঙ্গলাভ বর্ণের কুয়াশার নিচে হেঁটে যায় 'একপাল' মানুষ, তাদের ঘাড় নিচু, মাথা নিচু। তাদের দৃষ্টি পায়ের পাতার দিকে স্থির। এই কাব্যের প্রথম পর্বের শেষে আছে—

'তোমার বাগানে এক লাশ পুঁতে রেখেছিলে বিগত বৎসরে,

সেই লাশ অঙ্কুরিত হতে শুরু এতদিনে?'

স্পষ্টতই এখানে বাইবেলের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কাহিনিটি মনে পড়ে।

কবিতার এই অংশে বিনষ্ট সভ্যতার শরীর। চারিদিকে কেবলই ধ্বংসের ছবি। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ আর পঙ্গু অর্থনীতির পাশে মানুষের অনুভূতিগুলিও মৃত। সমাজ ও মানুষ আর নতুন করে সৃজনক্ষম নয়। ইতিহাসের মৃত্যু হলে জীবন কি আর নতুন করে জেগে উঠতে পারে?

কবিতার দ্বিতীয় অংশ 'দাবা-খেলা'তে ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক যৌনপ্রতীক এবং বন্ধ্যা পৃথিবীর কথা দ্যোতিত হয়েছে এখানে। তৃতীয় অংশ 'অগ্নি-বাণী' বুদ্ধের উপদেশকে স্মরণ করে লেখা। চতুর্থ অংশে জমে মৃত্যুর মধ্যে একাধারে খ্রিস্টধর্মের ভাষ্য এবং হিন্দুধর্মের প্রতিমা বিসর্জনের ধারণা নিহিত আছে। পঞ্চম অংশ 'বজ্রবাণী'-তে তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'দত্ত', 'দয়দ্ধম', 'দাম্যম্' অর্থাৎ দান, দয়া, দমন শব্দ তিনটির উল্লেখ করেছেন এবং উপনিষদের শান্তিমন্ত্রের উল্লেখে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন—

'Datta. Dayadhvam. Damyata.

Shantih shantih shantih.'

এই কবিতায় আসলে বিভিন্ন ধর্মের মিথের মাধ্যমে কবি আধুনিক সভ্যতার পাণ্ডুর চেহারাটাই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন বৈনাশিকতা শুধু একালের ব্যাপার নয়, এ এক অনাদ্যন্ত প্রবাহ। পাশ্চাত্যের পোড়ো জমির ওপর প্রাচ্যের শান্তিমন্ত্রের উচ্চারণ করে যুদ্ধসংক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তির আবাহন করা হয়েছে।